অমর একুশে বইমেলার সাহিত্যিক মুখপত্র

www.sharetindinerpotrika.com

সাড়ে তিন দিনের প.ত্রি.কা

অর্ধ - সাপ্তাহিক

বর্ষ ৪ । সংখ্যা ১ । বৃহস্পতিবার । ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ । ১৩ ফাল্গুন ১৪৩২

শুভেচ্ছা মূল্য ২০ টাকা

ভাষা সংখ্যা

সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন কী ও কেন

কুদরত-ই-হুদা

অলঙ্করণ : লুৎফি রুনা

প্রধান রচনা

সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন বলে একটা কথা চালু আছে। কথাটা আমাদের দেশে প্রায় প্রবাদের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সব প্রবাদের মধ্যে একটা সমাজের দীর্ঘদিনের ভালো-মন্দের অভিজ্ঞতা জমাট বেঁধে থাকে। প্রবাদপ্রতিম এই বাক্যের মধ্যেও আছে। কী সেই অভিজ্ঞতা? অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যত স্তর আছে, সব স্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন থাকাটা জরুরি। এর মধ্যে দেশ ও জাতির মঙ্গল নিহিত আছে। রাষ্ট্রের স্তর বলতে আপাতত নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ বুঝলেই চলবে। এই তিন বিভাগের আওতায় রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজকর্ম চলে। তার মানে সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন বলতে আমরা বুঝব রাষ্ট্রপতির দপ্তর থেকে শুরু করে মুদি দোকান—সবখানে বাংলা ভাষার নির্বিকল্প ব্যবহার হওয়াকে।

মাতৃভাষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে রাষ্ট্রের সকল স্তরে ব্যবহার না করলে অনেক সমস্যা হয়। ব্যবহার করলে অনেক সুবিধা। সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন ঘটালে কী সুবিধা সে কথা বিশদ করা যাক।

এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়

অনুবাদ । প্রবন্ধ

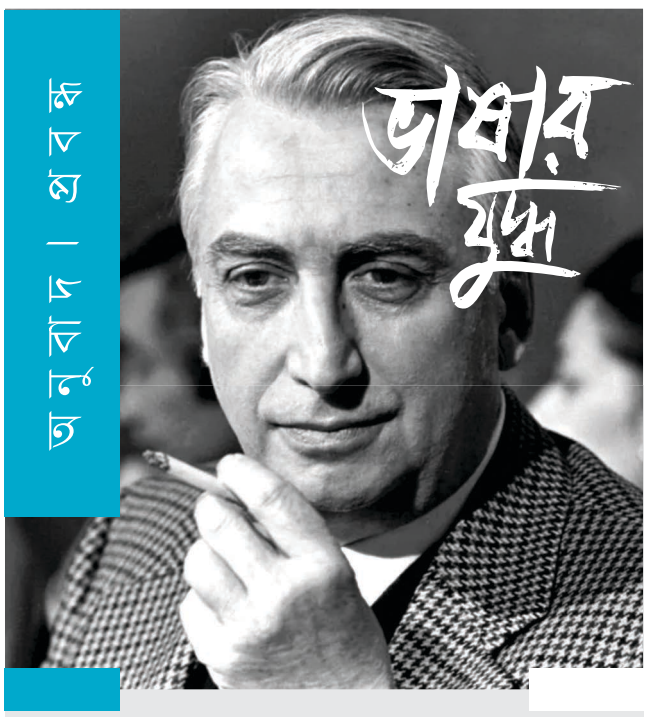

ভাষার যুদ্ধ

রোলাঁ বার্থ

একবার আমার অঞ্চলে, অর্থাৎ ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আমলাদের আবাসনের আধিক্য থাকা উপত্যকায় হাঁটছিলাম। তখন কয়েকশো গজ দূরের ব্যবধানে থাকা তিনটি বড় বাড়িতে তিনটি ভিন্ন সাইনপোস্ট দেখতে পাই। সেগুলো হলো : হিংস্র কুকুর হতে সাবধান, ভয়াবহ কুকুর হতে সাবধান, পাহারায় কুকুর নিয়োজিত।

আমার এই অঞ্চলের প্রতিটি বাড়ির মধ্যে মালিকানার ধারণাটি টনটনে। তবে এই তিনটি আলাদা সাইনকে ঠিক 'অত্র সীমানায় প্রবেশ করবেন না' (করলে কুকুরের কামড় খাবেন) বার্তার সঙ্গে তুলনা করলে এতটাও আকর্ষণীয় মনে হওয়ার কথা না। কারণ, ভাষাবিজ্ঞান শুধু বার্তা নিয়ে কাজ করে। কোনো বার্তার অর্থকে তার প্রকাশভঙ্গির জন্য ক্লান্তিকরভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা ভাষাবিজ্ঞানের থাকে না। অন্য ভাষায়, এই তিনটি আলাদা বাক্য একটিই বার্তা দেয়। কিন্তু এই তিন বার্তার ক্ষেত্রে আমাদের সামনে তিনটি বিকল্প—ইচ্ছে, মানসিকতা এবং মালিকানার ওজর উপস্থিত হয়।

এই তিন সাইনপোস্টের ভাষাকে আমরা মালিকানার ডিসকোর্স বলে অভিহিত করতে পারি। তিনটি সাইনপোস্টই মালিকদের বিষয়ে তিনটি আলাদা মানসিক ধারণা তৈরি করে। অর্থাৎ বাড়ির মালিকদের বিষয়েও তিনটি ধারণা তৈরি করে। যেমন, প্রথম ক্ষেত্রে মনে হয় বাড়ির মালিক কিছুটা বেপরোয়া। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে 'ভয়াবহ' শব্দটি দেখে মনে হয়, এই বাড়িটিতে অস্ত্র থাকলেও থাকতে পারে। আর সর্বশেষ বাক্যটিতে বোঝা যায়, শুধু ওই সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য কুকুরের উপস্থিতি। এই একটি বার্তা, অর্থাৎ 'এখানে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ'—এ কথাই ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আর এখান থেকেই বোঝা যায়, ভাষার মধ্যেও একধরনের বিভাজন রয়েছে। আর এই বিভাজনকে কোনো বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ পদ্ধতিই

এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

। সাক্ষাৎকার ।

পোর্ট্রেট : রাজীব রাজু

ভাষায় প্রাণসঞ্চার হলে সাহিত্যে প্রতিফলন ঘটে

—সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর জন্ম ১৯৩৬ সালে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক। সমাজ-রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গভীর বিশ্লেষণধর্মী লেখালেখির জন্য তিনি সুপরিচিত। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে—*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাসে স্মৃতিতে*, *বাঙালীর জাতীয়তাবাদ*, *সাহিত্যের অন্তর্জগৎ*, *রবীন্দ্রনাথ কেন জরুরি*, ইত্যাদি। *সাড়ে ৩ দিনের পত্রিকার* জন্য সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন **মার্যিউর রহমান চৌধুরী**

আপনি অতীতে বহুবার বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জিত হলেও এ নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে। আর এই মুক্তির জন্য সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রয়োগের তাগাদাও দিয়ে এসেছেন। বিষয়টিকে যদি সবিস্তারে আলোচনা করেন।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : ১৯৫২ সাল থেকে ২০২৬ সাল—এই দীর্ঘ ৭৪ বছরের হিসাব করলে আমাদের জাতীয়

এরপর ২য় পৃষ্ঠায়

১ম পৃষ্ঠার পর

ভাষায় প্রাণ সঞ্চার...

ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রয়েছে। সম্প্রতি ২০২৪ সালে জুলাই গণঅভ্যুত্থান একটি নতুন সংযোজন। তবে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মতো স্বাধীনতার সংগ্রামকেও আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। মূলত ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত এবং এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের স্বাধীনতা অর্জন। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে গণমানুষের মুক্তি পাইনি। এই মুক্তি তখনই সম্ভব, যখন সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে আমরা বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারব। কিন্তু প্রকৃত মুক্তির জন্য বাংলা ভাষার প্রয়োগ কেন জরুরি? এর কারণ হলো, বাংলা ভাষার প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা আরও স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারব এবং ঐক্যবদ্ধ হতে পারব। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৫৭ বছরেও আমরা বাংলা ভাষাকে সর্বজনীন করতে পারিনি। তাই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আমাদের সংগ্রাম এখনও থামেনি এবং তা সামনেও চলবে।

বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের সংগ্রামের বিষয়টি আসলে কেমন?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : বিষয়টি জটিল। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির একাধিক শত্রু-মিত্র রয়েছে। ভেতরে ও বাইরে সংস্কৃতির প্রতিপক্ষগুলো এখনও জিইয়ে রয়েছে। আর এর বিরুদ্ধে আমরা বরাবরই সমাজবিপ্লবের কথা বলি। কিন্তু এই সমাজবিপ্লব তখনই সম্ভব, যখন সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। এ কথা সত্য, সংস্কৃতির আদর্শ নিরপেক্ষ হওয়ার সুযোগ নেই। বিপ্লবীরা সমাজ বদলের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন রূপে সংস্কৃতির চর্চা করবে। আর এ ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভূমিকা থাকতে হবে একদম শীর্ষে। সাহিত্যের বাহন যেহেতু ভাষা, তাই ভাষাকে অবারিত করা এবং তাকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উন্নীত করা অত্যন্ত জরুরি। এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষার সাহিত্যসম্ভার সমৃদ্ধ হয়েছে নানা সাহিত্যিক, চিন্তক ও বুদ্ধিজীবীর নিরলস পরিশ্রমের বদৌলতে। কিন্তু চূড়ান্ত অর্থে বাঙালিকে এখনও সাহিত্য ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। কেন পারেনি? কারণ সমাজে শ্রেণিবিভাজন প্রবল। ভুলে গেলে চলবে না, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক। এই জাতীয়তাবাদের বোধের ব্যাপারটা একেবারেই প্রাথমিক। শ্রেণিচেতনার মতো অত শক্তিশালী না হলেও, কাছাকাছি বটে।

কিন্তু এই জাতীয়তাবাদী বোধ এখনও আমাদের মধ্যে শক্তিশালী কেন হতে পারেনি?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : উত্তরটা সহজ। শ্রেণিবিভাজনের কারণে বাঙালি এখনও তার ভাষা দ্বারা বিভক্ত। যেমন অতীতে সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতা ছিল। এই সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতাকে দূর করার জন্যই আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান সব বাঙালিকে আজও শিক্ষিত করে তুলতে পারেনি বলেই মনে হচ্ছে। শিক্ষিত বাঙালিদের প্রায় সবাই প্রয়োজনের বাইরে শুধু জ্ঞানচর্চার জন্য বই পড়েন না। এদিকে উচ্চশিক্ষিতরা এখন ইংরেজি চর্চায় ব্যতিব্যস্ত। অথচ আমাদের রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য যে আন্দোলন তার রূপটা ছিল গণতান্ত্রিক, ভেতরের আকাঙ্ক্ষাটা ছিল সমাজতান্ত্রিক। অস্বীকার করার পথ নেই, ওই পথেই নতুন রাষ্ট্র এসেছে, যে রাষ্ট্রের লক্ষ্য গণতন্ত্র তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, রাষ্ট্র ওই লক্ষ্য থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যেতে থাকল এবং যাচ্ছেও। সাম্প্রতিক সময়ের প্রতিটি ঘটনা অন্তত সেদিকেই ইঙ্গিত করে।

তার মানে রাষ্ট্রভাষা হওয়ার পরও বাংলা রাষ্ট্র ও সমাজের ভাষা হতে পারছে না।

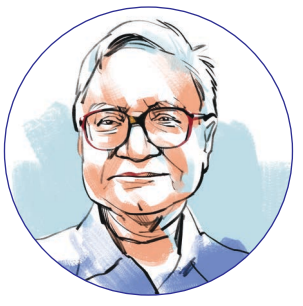

এ কথা সত্য, সংস্কৃতির আদর্শ নিরপেক্ষ হওয়ার সুযোগ নেই। বিপ্লবীরা সমাজ বদলের ক্ষেত্রে পরিচ্ছন্ন রূপে সংস্কৃতির চর্চা করবে। আর এ ক্ষেত্রে সাহিত্যের ভূমিকা থাকতে হবে একদম শীর্ষে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : হ্যাঁ। এর কারণও স্পষ্ট। একটি বিশেষ শ্রেণি রাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ হিসেবে বিরাজমান। এমন অবস্থায় সংস্কৃতির গতি যেমন শ্লথ হওয়ার কথা তেমনই হয়েছে এবং হচ্ছে। এই শ্লথ গতির বিরুদ্ধে অনেকেই সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে যুক্ত রয়েছেন এবং তাদের আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি নেই। কিন্তু ওই যে, তাদের সামনে সীমাবদ্ধতার দেয়ালটি এখনও অনেক উঁচু। এখনকার পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, আগ্রাসী বিশ্বায়ন বাঙালির জন্য দাঁড়ানোর কোনো জায়গা রাখবে না। ইতোমধ্যে কিছু আলামতও দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্রসংগীতকে এখন পপসংগীত বানানোর প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। এমনকি সংগীতের নামে আদিম হল্লার গ্রহণযোগ্যতাই যেন বাড়ছে। তবে ভুলে গেলে চলবে না, যে সংস্কৃতিকে আমরা বাঙালি সংস্কৃতি বলে গণ্য করতে চাইব তার প্রতিশ্রুতি ছিল রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। তাকে হতে হবে ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক ও ইহজাগতিক, যার মধ্যে থাকবে বাঙালির সংগ্রামশীলতার প্রকাশ। সেই সঙ্গে সে হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কীভাবে করা যাবে এই কাজ? সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ার একটা উপায় হচ্ছে তাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা।

ঐতিহাসিকভাবে বাংলা ভাষার প্রচার-প্রসার ও গঠনে মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি বড় প্রভাব রয়েছে বলেই অনেকের অভিমত। আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাঠামোই এমন যে তাদের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যাখ্যান করা কঠিন কিছু নয়। ঐতিহাসিকভাবে বাঙালি মধ্যবিত্তের ভালো সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রমের তালিকা ছোট নয়। আমরা যে বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয়ে পরিচিত হই, কিছুটা হলেও গর্ব করি, তার গঠনে মধ্যবিত্তের ভূমিকাই প্রধান। এই সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণে উচ্চবিত্ত থেকেছে উদাসীন; বিত্তহীনদের কথা আলাদা। এ ক্ষেত্রে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার কাজটা মধ্যবিত্তই করেছে, তাকেই করতে হয়েছে। না করে উপায় ছিল না। কেননা, সব দেশেই মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিমনস্ক, আমাদের দেশেও তা-ই। আমাদের দেশে হয়তো কিছুটা বেশিই। কেননা, অন্যান্য ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অর্থনীতিতে, আমাদের অর্জনটা উৎফুল্ল হওয়ার মতো নয়, বরং বেশ ম্রিয়মাণ। সেজন্য মধ্যবিত্তের পক্ষে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্যকলা, শিল্পকলার ওপর জোর দিতে হয়েছে। কেননা, সংস্কৃতিতেই সে সৃজনশীল হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, অন্যত্র নয়। ব্যাপার আরও ছিল, সেটা হলো আত্মপরিচয়। সংস্কৃতি দিয়েই সে নিজেকে পরিচিত করেছে...

কাছে তো বটেই নিজের কাছেও। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই মানুষ। পারিবারিকভাবে রবীন্দ্রনাথরা জমিদার ছিলেন ঠিকই, কিন্তু রুচি ও সংস্কৃতিতে তিনি নিজে ছিলেন মধ্যবিত্ত। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, মধুসূদন ও বেগম রোকেয়াও মধ্যবিত্তই। আলাউদ্দিন খাঁ, উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্কর, সত্যজিৎ রায়, জয়নুল আবেদীন এই শ্রেণি থেকেই এসেছেন।

সাক্ষাৎকারটির বাকি অংশ পড়তে স্ক্যান করুন

১ম পৃষ্ঠার পর

ভাষার যুদ্ধ...

ব্যাখ্যা করতে পারে না। সমাজের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং মানসিক বিকাশের কাঠামো একে অপরের সঙ্গে সংঘাত বাধায়। আর তা দেখে মনে হয়, আমরা যে সমাজে বাস করি সেখানে একটি যুদ্ধের ময়দানের ঘাত-প্রতিঘাতেই ভাষা গঠিত হয়।

যেকোনো ভাষায় একই বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রকাশ করাকে আমরা বলছি প্রতিশব্দ। আর এই প্রতিশব্দের মাধ্যমে ভাষার মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়। অবশ্য এই বিভাজন ভাষার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কারণ তা কাঠামো এবং নিয়ম মেনেই ঘটে। কিন্তু ভাষার মধ্যকার বিবাদকে আমরা স্বাভাবিক বলতে পারি না। এমনটি তখনই ঘটে, যখন সমাজের মধ্যকার বিভাজনগুলো সংঘাতে রূপ নেয়। বলা যেতে পারে, সমাজের শ্রেণিবিভাজন, প্রতীকী বিচ্ছিন্নতা, ভাষার মধ্যকার বিভাজন এবং মানসিক কল্পনা—এসবের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই।

আমি এখানে সমাজের একটি শ্রেণি অর্থাৎ ক্ষুদ্র জমিদারদের ভাষা থেকে উদাহরণ টেনেছি। তবে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক পরিকাঠামোতে বিভিন্ন শ্রেণির ভাষাভঙ্গিকে আমরা এভাবেই প্রকাশ করতে পারি। অর্থাৎ, বিশাল জনগোষ্ঠীর ভাষার মধ্যেও বেশ বড় ধরনের পার্থক্য লক্ষ করা যাবে। কিন্তু এখানে কিছু বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি। ভাষার বিভাজন সমাজে বিদ্যমান শ্রেণিবিভাজনের সঙ্গে হুবহুভাবে বিচার করা যায় না। এ ক্ষেত্রে ভাষাব্যবস্থার মধ্যকার পরিকাঠামোগুলো একে অপরের সঙ্গে সংঘাতে রয়েছে। এখানে নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান সংঘাতে নয়। ভাষার এই বিভাজন মূলত যোগাযোগ স্থাপনের আঙ্গিকে বিচার করতে হয়। এই সংঘাত তৈরি হয়েছে জাতীয়তার ধারণা থেকে। কোনো জাতীয় পরিসরে এ জন্যই ভাষাকে উদারভাবে চর্চা করা যায়।

আধুনিক সমাজে ভাষার বিভাজনের সঙ্গে ক্ষমতার সম্পর্ক রয়েছে। কিছু কিছু ভাষার প্রচার-প্রসার ঘটে, কারণ সেগুলোর পেছনে ক্ষমতায়নের প্রভাব রয়েছে। এসব ক্ষমতায়ন ঘটে ওই অঞ্চলের প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শিক প্রভাবের কারণে। এই ভাষাকে আমরা স্বাভাবিক বলি, অর্থাৎ এই ভাষাই মানুষ প্রতিনিয়ত কথা বলতে ব্যবহার করে, এই ভাষাতেই জনগণের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আবার কিছু কিছু ভাষা রয়েছে যেগুলো ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে থাকে কিংবা এর বিরুদ্ধে অবস্থান করে। এই দুই ধরনের ভাষার রূপ এক নয়। এ ধরনের ভাষা কোনো পদ্ধতিগত কাঠামোর নয়। এ ধরনের ভাষা মূলত ভাবনার মাধ্যমে গড়ে ওঠে, আদর্শের ভিত্তিতে নয়। এর একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে 'মার্ক্সের তত্ত্ব'। তবে অদ্ভুত হলেও সত্য, এ ভাষার মধ্যেও বর্তমানে ব্যাকরণিক কাঠামো এবং উপভাষার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। নিৎসের ভাষায় এই অবস্থাকে আমরা ফিকশনের 'বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব' বলে অভিহিত করতে পারি। তাঁর মতে, কোনো ভাষায় একটি নির্দিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণিই এই ভাবনার প্রচার-প্রসারে কাজ করে। ভাষার এই কাল্পনিক দিককে ব্যবহারের ক্ষেত্রে শ্রেণিগুলোকে টেকনিশিয়ান বলে অভিহিত করা যেতে পারে। যেমন খ্রিষ্টীয় ধারণার প্রচারে পাদরিদের গোষ্ঠী সব ভাষাতেই অবদান রেখেছে। মার্ক্সীয় এবং মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রেও তাত্ত্বিকদের এমন ভূমিকা দেখা গেছে।

এ ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বোঝা জরুরি। যেকোনো শক্তিশালী ভাষা কাঠামোতে প্রতিটি ডিসকোর্স বা তত্ত্বীয় ধারণাই এক ধরনের উপস্থাপনা (রিপ্রেজেন্টেশন)। অর্থাৎ ভাষায় কোনো তর্ক, বিবাদ, কটূক্তি এমনকি নাটকীয় দৃশ্যকে মঞ্চস্থ করা হয়। যখন কেউ তা পাঠ করে, তখন এই উপস্থাপনাকে উদারভাবেই ধারণ করে। দ্বিতীয়ত, যেকোনো লেখার বা অংশীজনকে বিভিন্ন ডিসকোর্সের আংশিক দিক তুলে ধরা সম্ভব। আর এই উপস্থাপনার মাধ্যমে সমাজের সব গোষ্ঠীকে ওই ধারণাগুলোকে আত্মস্থ করার অনুপ্রেরণা দেওয়া হয়। সবশেষে বলে নেওয়া ভালো, যেকোনো বাক্যই প্রতীকের নিরিখে এক ধরনের অস্ত্র। পূর্ণাঙ্গ বাক্য দিয়ে আমরা কাউকে অনুপ্রেরণা জোগাতে পারি, কাউকে ভয় দেখাতে পারি। যখনই কোনো ভাষা দিয়ে আমরা কিছু উপস্থাপনা করতে চাই, তখন এই তাত্ত্বিক ধারণাকে নির্দিষ্ট বিষয়ের ভেক দিয়ে এমনভাবে উপস্থাপন করি যাতে কেউ পড়ে তা থেকে কিছু বুঝে নিতে পারে। তাই যখনই কোনো নির্দিষ্ট ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করা যায়, তখন ওই ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষমতার কাছেও পৌঁছানো যায়। শুধু ব্যাকরণের মাধ্যমে আমরা বাক্যের সঙ্গে ক্ষমতার এই সম্পর্ক বুঝতে পারি না। বিষয়টি বোঝা সম্ভব মূলত ভাষার মধ্যকার বিবাদের কাল্পনিক দিক থেকে।

পৃথিবীর কোনো ভাষার ব্যাকরণ এখন পর্যন্ত ভাষার এই কাল্পনিক ও ভাবনাগত দিককে সবিস্তারে উল্লেখ করেনি। প্রশ্ন জাগে, তাহলে আমরা কীভাবে ভাষার মধ্যকার বিবাদকে চিহ্নিত করব? যেহেতু বলছি ভাষার মধ্যকার যুদ্ধ সবক্ষেত্রেই ঘটে, আমাদের এ ক্ষেত্রে কী করার আছে? এখানে আমরা বলতে মূলত বুদ্ধিজীবী, লেখক এবং ভাষার কাঠামোগত ডিসকোর্স নিয়ে যারা গবেষণা করেন তাদের বুঝিয়েছি। ভাষার এই বিবাদ আমাদের বলে দেয়, একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির অধীনে আমাদের নির্দিষ্ট কোনো ভাষার সঙ্গে ঐতিহাসিক কারণে যুক্ত থাকতে হয়। আর এই যুক্ততাকে গুরুত্ব দিতে হলে আমাদের ভাষার বহুমাত্রিক দর্শনকে মেনে নিয়েই কাজ করতে হবে।

ভাষান্তর : আমিরুল আবেদিন

১৯৮৪ সালে প্রকাশিত 'দ্য রাসল অব ল্যাঙ্গুয়েজ' প্রবন্ধ সংকলন থেকে আংশিক অনুবাদ করা হয়েছে।]

১ম পৃষ্ঠার পর

সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন...

ভাষাকে যত বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলার ভেতর দিয়ে যেতে দেয়া হবে বা নিয়ে যাওয়া হবে, ভাষা তত শক্তিশালী হবে। ভাষা বিচিত্র পরিস্থিতি প্রকাশের সক্ষমতা অর্জন করবে। বহুবিচিত্র কাজের ভেতর দিয়ে ভাষাকে যেতে না দিয়ে নন্দগোপালটির মতো শুধু কাগুজে মর্যাদার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে, শুদ্ধতা শুদ্ধতা বলে চিৎকার করে 'সম্মানের চিরনির্বাসনে' কোলে কোলে তুলে রেখে সবকিছু থেকে সরিয়ে রাখলে এই ভাষা কোনোদিন সর্বপরিস্থিতি ব্যাখ্যাক্ষম হয়ে উঠবে না।

উদাহরণ হিসেবে আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যায়। আদালত-সংশ্লিষ্ট প্রায় সবাই একবাক্যে হুক্কাহুয়া করে ওঠেন যে, বাংলায় আদালত চালানো সম্ভব নয়। রায় লেখা আরো অসম্ভব। তার মানে বাংলা ভাষাটিকে আদালত মোকাবিলা করতে দেয়া হচ্ছে না। নন্দগোপালটির মতো এই পরিস্থিতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। ফলে বাংলা ভাষা আদালতে ব্যবহৃত হয়ে যে সমৃদ্ধি ও প্রকাশক্ষমতা অর্জন করতে পারত তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই ঘটনাটা ঘটতে দেয়া হয়েছে ও হচ্ছে রাষ্ট্রের চোখের সামনে এবং এক প্রকার রাষ্ট্রের প্রযোজনায়। এ গেল একদিক।

অন্যদিকটি আরো ভয়াবহ এবং ওই সর্বস্তরে রাষ্ট্রভাষা প্রচলনের সাথেই যুক্ত। আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার হয় না। কারণ, আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেউই আদালত-বিদ্যাটা বাংলায় পড়েন না। যে দেশে শিক্ষায় বাংলা ভাষার ব্যবহার নেই, সে দেশে শিক্ষার প্রয়োগক্ষেত্রে বাংলা চালু থাকবে তা কী করে হতে পারে! ফলে রক্তের দামে কেনা আপামর বাঙালির প্রিয় বাংলা ভাষাটি একটি দুষ্টচক্রের আবর্তে আবর্তিত হতে হতে শুধু হীনবলই হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় শিক্ষিত শ্রেণির সবাই মিলে ঘোষণা করবে যে, বাংলা ভাষা ঠিক সব জায়গার জন্য ফিট না। এখনই অবশ্য ওই শ্রেণির অনেকে কথাটা বলে থাকেন।

পৃথিবীর একেক ভাষা একেক ধরনের জীবনাভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার ভেতর দিয়ে যায়। এই অর্থে ভাষা মানেই অভিজ্ঞতার আকর। যে-ভাষা যত রকম অভিজ্ঞতা-বাস্তবতাকে ধারণ করে সে-ভাষা তত শক্তিশালী। অনুবাদের মাধ্যমে এক ভাষা আরেক ভাষার অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। এতে করে অনূদিত ভাষার শক্তি অর্জনের দ্বার উন্মুক্ত হয়। দুঃখজনকভাবে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয় অত্যন্ত কম। আবার এখানে অনুবাদ সম্পর্কে যে ধারণাটা চালু আছে তা সংকীর্ণ ও গোলমেলে। অনুবাদ বলতে এখানে শুধু সাহিত্যের অনুবাদকেই বোঝায়। কিন্তু পৃথিবীর বিচিত্র ভাষায় ওইসব জনগোষ্ঠীর কত নতুন কাজ, ভাবনা, চিন্তা, দর্শন, তত্ত্ব, কর্মপরিসর জমা হচ্ছে! বাংলা ভাষা যত ওইসবের মুখোমুখি হতে পারবে ততই শক্তিশালী ও প্রকাশক্ষম হয়ে উঠবে। কিন্তু বাংলায় একে তো অনুবাদ কম হয়, আবার যা হয় তার অধিকাংশই অপাঠ্য। অধিকাংশ অনুবাদের বাক্য ইংরেজি বাক্যের মতো। কৃত্রিমতা এইসব অনুবাদের প্রধান অলংকার। হবে না কেন! বাংলা তো একটা আলাদা ভাষা। এই ভাষা কেন অন্য ভাষার বাক্যগঠনরীতির মধ্যে সঠিক, সজীব, জিয়ল অর্থ উৎপাদন করবে! ইংরেজি বাক্যের গঠনের মধ্যে বাঙালি পাঠক বাংলা পড়ার আনন্দ পাবে কী করে! বাংলার তো একটা নিজস্ব চলনভঙ্গি, ঠাটবাট আছে, নাকি!

পৃথিবীর দেশে দেশে কেন মাতৃভাষাকে শিক্ষার এবং সকল কাজের বাহন হিসেবে চালু রাখা হয়? এদিক থেকে দেখলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলনের অর্থ অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। মাতৃভাষাতেই মানুষ চিন্তায় ও সৃজনে সবচেয়ে বেশি লীলাময় থাকে। মাতৃভাষাতেই ভাবনারাশিকে সহজেই শক্ত ভিত্তি ও গাঁথুনির ওপর দাঁড় করানো যায়। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিসরে মাতৃভাষার ভিত্তি শক্তিশালী ও মর্যাদাপূর্ণ না হলে কোনো সমাজে-রাষ্ট্রে মৌলিক চিন্তার মানুষ দেখা দেয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। বাংলাদেশে যে নতুন নতুন মৌলিক চিন্তার জগতে শূন্যতা বিরাজ করে, এর অন্যতম কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে চিন্তার চর্চা না থাকা। কোনো প্রকার জরিপ ছাড়াই বলা যায়, বাংলাদেশে বাংলা ভাষার চর্চা এখানে বিদেশি ভাষাচর্চার চেয়েও নিম্নমানের। বাংলা চর্চার পরিসর এখানে এতই সংকুচিত যে, মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমে উন্নতি করেছে এমন সব দেশে বিদেশি ভাষা চর্চার মাত্রা ও সুযোগের সাথেও তুলনীয় হবার নয়। বাংলাদেশে বাংলা চর্চার মান এখানকার বাংলা ভাষায় লেখা যেকোনো সরকারি ডকুমেন্ট বা বাংলা ভাষায় লেখা গবেষণাপত্রগুলোর দিকে চোখ রাখলেই বোঝা যায়। বাংলা ভাষাটা যে এ দেশে এখনো সজীব ও সচল আছে তা শুধু সাধারণ-গরিব মানুষদের মুখে মুখে হাটে মাঠে ঘাটে ব্যবহারের কারণেই। টাকাওয়ালা কেউ এখানে আর বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করে না। ১৯৪৮ সালে যে-কারণে বাংলা ভাষাকে আইন পরিষদে ব্যবহারের অনুপযুক্ত মনে করা হয়েছিল সেই একই কারণে এখনো বাংলাকে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে। তখনও বাংলাকে মনে করা হতো সাধারণ-গরিব পূর্ব বাংলার মানুষদের ব্রাত্যভাষা, এখনো তাই-ই মনে করা হয়। উর্দুর জায়গায় কেবল ইংরেজি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। বাংলার সাথে এখানে ইংরেজি বা উর্দুর আভিজাত্য এখনো যুক্ত হয়নি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাংলা একটা কাগুজে বাঘ; শোলার বাঘ; থাবাক্ষমতারহিত। রাষ্ট্র পরিকল্পিতভাবে একে এই অবস্থা করে রেখেছে। অমর্যাদাকর পরিস্থিতির মধ্যে রেখে দিয়েছে।

এই উত্থানরহিত, থাবারহিত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সর্বস্তরে এর বহুবিচিত্র প্রয়োগ দরকার। সর্বস্তরে মানে সর্বক্ষেত্রে। ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-আদালত, শাসনকার্য, রাজনীতি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ধর্ম, শিক্ষার সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন দরকার। এটা ব্যক্তি উদ্যোগের ব্যাপার না। রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ও তৎপরতার ব্যাপার।

ভাষাকে যত বিভিন্ন পরিস্থিতি মোকাবিলার ভেতর দিয়ে যেতে দেয়া হবে বা নিয়ে যাওয়া হবে, ভাষা তত শক্তিশালী হবে। ভাষা বিচিত্র পরিস্থিতি প্রকাশের সক্ষমতা অর্জন করবে।

স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমরা শুধু জাতীয়তাবাদী আবেগের ফেনা তুলতে পেরেছি। বাংলা ভাষার প্রশ্নে আমরা একটা শবভুক জাতিতে পরিণত হয়েছি। অতীতের গৌরবের গীত গাওয়া ও আত্মশ্লাঘা বোধ করাই আমাদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা থেকে যত দ্রুত বের হওয়া যায় ততই মঙ্গল। রাষ্ট্রের সর্বস্তরে মর্যাদার সাথে বাংলা চর্চা না হওয়ার কারণে ভাষাটি দিনদিন হীনবল হয়ে পড়ছে। শুধু সাহিত্যচর্চা করে এই ভাষার শক্তি ও শ্রী পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। মনে রাখতে হবে আজকাল ভাষা বিষয়ে এই থিসিসও বের হয়েছে যে, সর্বস্তরে মাতৃভাষার ব্যবহার যথাযথভাবে চালু থাকলে জিডিপির হার বেড়ে যায়। কেন ও কীভাবে সেটা রাষ্ট্রকেই উপলব্ধি করতে হবে।

লেখক : প্রাবন্ধিক ও গবেষক

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভাষার মানসিক...

এখানেই চলে আসে। বইমেলা সারাবছরই বিভিন্ন অঞ্চলে হয়। খোদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই বিভিন্ন উপলক্ষে বইমেলার আয়োজন হয়। কিন্তু সবাই বইমেলা বলতে একুশে বইমেলাকেই বোঝে। সবার ভাবনা ওই একটি মাসেই নিবদ্ধ থাকে। এটিও ভাষার চমৎকার মানসিক দিক। ভাষা শুধু মানসিক দিক নয়, এর প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক দিকও আছে। সেই দিকগুলোকে বিবেচনা করেই আমরা সংশ্লিষ্টতা খুঁজি। একজন ভাষাবিজ্ঞানীকে গুরুত্ব দেওয়ার কাজটি করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এই ঘোষণার পর থেকেই 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' (আমাই) প্রতিষ্ঠার বীজটুকু বপন হয়ে যায়। প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া সম্ভব হয় ২০০১ সালে। ওই বছর ১৫ মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে ইনস্টিটিউটটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই ইনস্টিটিউটের আইন অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রধানমন্ত্রী। ২০০৬ সালে ইনস্টিটিউটটির ভবন পুরোপুরি কার্যকর হয়। এরপর ২০১৬ সালে ইউনেস্কো এটিকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মূলত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিগুলোর ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, এ সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির একটি গবেষণা বৃত্তি রয়েছে।

আমাদের গবেষণার ক্ষেত্রে জাতীয় ঐতিহ্যগত চেতনার ধারাবাহিকতা আছে। আমরা বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব যেমন দেই, অন্য ভাষার গবেষণা নিয়েও কাজ করতে চাই। কিন্তু বাংলায় এ নিয়ে রেফারেন্স বইয়ের সংকট অনেক। অর্থাৎ, আমার কাছে ব্যাকরণ বই রয়েছে। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাস নিয়ে কোনো বই নেই। ফলে রেফারেন্স সংকট থাকে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন সভা ও সেমিনারের মাধ্যমেই ভাষাকে নিয়ে চর্চা বেশি হয়। চর্চা হয় বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমেও। এ বিষয়গুলো নিয়ে আসলে প্রকাশনা, সংবাদমাধ্যম এমনকি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়েরও ধারণা কম। আমাদের ইনস্টিটিউট বাংলাসহ পৃথিবীর সব ভাষার বিবর্তন বিষয়ক গবেষণা ও ভাষা বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশি-বিদেশিদের ফেলোশিপ দিয়ে থাকে। ইতোমধ্যে ভাষা ও ভাষাবিষয়ক গবেষণায় অবদানের জন্য দেশি ও বিদেশিদের ইনস্টিটিউট থেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক' দেওয়া হচ্ছে। ২০২১ সাল থেকে এ পদক ও সম্মাননা দেওয়া শুরু হয়েছে। ২০২৪ সালেও আমরা এ সম্মাননা দিয়েছি। এ বছরের সম্মাননার জন্য আমরা এখনও ভাষা বিষয়ে অবদান রাখা ব্যক্তিদের খুঁজছি। কিন্তু এই সম্মাননার জন্য আলাদা প্রক্রিয়া রয়েছে। আমরা সবসময় এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের খুঁজে পাই না। তাই বছরের একটি সময়ে সম্মাননার জন্য গবেষক, লেখক ও ভাষাবিজ্ঞান সংশ্লিষ্টদের আবেদনের সুযোগ দেই। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পদকটি দিয়ে থাকি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা বাদেও ২০২৪ সালে আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড শুরু করেছি। এই অলিম্পিয়াডের কার্যক্রম অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রটা এ বছর পুরোদমে আমার নেতৃত্বে হচ্ছে। এ জন্য প্রশংসাও পাচ্ছি। এই লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডটি ইন্টারন্যাশনাল লিঙ্গুইস্টিকস অলিম্পিয়াড নামক একটি সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা প্রায়ই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এই সংস্থার অধীনে অলিম্পিয়াডে যোগ দেয়। বাংলাদেশে এই অলিম্পিয়াড এই সংস্থার পক্ষে আয়োজন করে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

অধ্যাপনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আমাকে অনেক ব্যস্ত সময় পার করতে হয়। প্রতিষ্ঠানটির অনেক কার্যক্রম সফল করার জন্য মাঠ পর্যায়েও আমাকে ছুটতে হয়। আর এখানেই লোকবল সংকটের প্রসঙ্গ চলে আসে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এখনও যে নিয়োগ হয়ে থাকে, সেগুলো অধিকাংশ চুক্তিভিত্তিক। আবার স্থায়ী পদগুলো খালি থাকলেও যোগ্য লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। স্থায়ী নিয়োগের প্রক্রিয়াটিও দীর্ঘ।

যেহেতু আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে, তাই নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভর করি। এগুলো খুবই সংবেদনশীল বিষয়। এ ক্ষেত্রে আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কেও দোষী করতে পারি না। বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি। আস্তে আস্তে সব জটিলতা নিরসন হবে। কিন্তু এ বিষয়ে সচেতনতাও জরুরি। এই যে আমরা তিনটি ভিন্ন গবেষণাভিত্তিক কার্যক্রমের কথা বললাম, এগুলোর সব তথ্য ওয়েবসাইটেই রয়েছে। ওয়েবসাইটে গেলেই সবাই তা জানতে পারেন। শুধু আমাদের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট দিয়ে তো এর প্রচার-প্রসার সম্ভব না। আমাদের কাজ গবেষক এবং ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটি সংবাদমাধ্যম, প্রকাশনা এবং ভাষার অংশীজন সবাইকেই পালন করতে হবে। তাতে অন্তত ভাষার প্রচার-প্রসার ও চর্চাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই প্রতিষ্ঠানটির কথা অনেকে জানতে পারবেন। আর তা জানতে পারলে এত দিন যত শ্রম ও ক্লান্তি ছিল তা মুছে যাওয়ার সুযোগ গড়ে উঠবে।

লেখক : পরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

আমাদের ভাষা...

করার প্রাক্কালে সমমনা মানুষেরা পরস্পর মিলিত হয়ে, একে-অপরের গুণাবলির তারিফ করেছেন, দোষ দেখিয়ে দিচ্ছেন, পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রশস্ত করছেন, একই লক্ষ্যে কাজ করার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠা করছেন। অন্যান্য দেশের কথা বাদ দিয়ে বাঙালি সমাজের ঊনবিংশ শতাব্দীর কথাই ধরা যাক। রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা' থেকে ব্রাহ্মধর্মের সূত্রপাত। এই ব্রাহ্মধর্মের সংবৃদ্ধির কারণও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দুমেলায়'ই উত্তরকালে নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের রূপ এবং আকার পেয়েছে।

এমনকি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময়েও বাংলাদেশের জেলায় জেলায় নানা সাংস্কৃতিক সম্মেলন হতো। সেসব সম্মেলনে নানা জাতীয় সমস্যার বিষয় অত্যন্ত আন্তরিকতা সহকারে হিতৈষণার বাণী গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ত। সারা দেশে জ্ঞান-বিদ্যাচর্চার একটা হাওয়া আপনার থেকেই সৃষ্টি হতো।

কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে সে রকম কোনও কিছুই করা হয়নি। মাঝেমধ্যে কবিদের সম্মেলন, সাহিত্যিকদের অনুষ্ঠানের সংবাদ কাগজে দেখা যায়। সেগুলো ব্যয়বহুল হোটেলে অথবা জনগণের দুরধিগম্য অন্য কোনও স্থানে। এই জাতীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে লেখক-সাহিত্যিকেরা সমাজে প্রমাণ করতে চান তাঁরাও দামি লোক। কিন্তু যে মনোবৃত্তির কারণে গোটা দেশ এবং দেশের মানুষের দিকে পিঠ দিয়ে এই ধরনের সভার আয়োজন করা হয় তা অত্যন্ত সংকীর্ণ, তাই নিন্দনীয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কাগমারীতে একটা সাহিত্য সম্মেলনের কথা শুনেছি। এই সুদীর্ঘ সময়ের পরিসরে আর ঐ জাতীয় সভা বা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়নি।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ পড়বেন কি পড়বেন না, বর্ণমালার সংস্কার হবে কি হবে না ইত্যাদি বিষয়েও পণ্ডিতজনেরা সব ক্ষুদ্র আকারে হলেও নিজেরা একত্রিত হয়েছেন, মতামত রেখেছেন এবং গোটা জাতির কাছে এই গ্রহণ-বর্জনের কথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো আত্মরক্ষামূলক, আত্মবিকাশের কিছু নেই। সামরিক সরকারকে খুশি করার জন্য সরকারি উদ্যোগে অনেক সভা-সমিতি হয়েছে, সেগুলোতে আমাদের সংস্কৃতির বিরোধী ব্যক্তিবৃন্দই বক্তা এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করেছেন। জনগণ ওসব উদ্যোগ আয়োজনকে সব সময়ে ঘৃণার চোখেই দেখেছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে উচিত ছিল নানা বিষয়ে অনেকগুলো সাময়িকপত্রের আত্মপ্রকাশ। কিন্তু তা হচ্ছে না, বিনিময়ে কোলকাতার পত্র-পত্রিকা এসে আমাদের বাজার ছেয়ে ফেলেছে। আমরা কোলকাতার পত্র-পত্রিকা আসার বিরোধী নই। কিন্তু কোলকাতার পত্র-পত্রিকার আমাদের বাজারে এই একাধিপত্য মারাত্মক।

তার দুটি কারণ। প্রথমত, কোলকাতার পত্র-পত্রিকাগুলোতে যে ধরনের চিন্তা-চেতনার প্রকাশ পায় এবং যে ধরনের সমাজ আদর্শের ছবি তুলে ধরে, সে ধরনের সমাজ আমাদের জনগণের স্বার্থবিরোধী। তাই এক ভাষা-ভাষী অঞ্চল হলেও আমাদের সমস্যা এবং পশ্চিম-বাংলার সমস্যার ধরনটি এক নয়।

দ্বিতীয়ত, ওদেশের সব পত্র-পত্রিকা ব্যাপক হারে আমাদের দেশে আসতে থাকলে আমাদের দেশে সাময়িকপত্রের জন্ম এবং বিকাশ অনেক কারণে বিঘ্নিত হবে। আমাদের প্রতিভাবান এবং প্রতিশ্রুতিবান লেখক-সাহিত্যিকেরা পূর্ব-সংস্কারের বশে কোলকাতার কাগজে লেখা প্রকাশ করবেন এবং কোলকাতার কাগজগুলো বাজার রাখার কারণ হিসেবে কিছুসংখ্যক লেখকের লেখা প্রকাশ করবেন। তার ফল দাঁড়াবে আমাদের দেশে চিন্তাসমৃদ্ধ, সৃষ্টিধর্মী কাগজের প্রকাশ বিলম্বিত হবে।

আমাদের সব সমস্যা তো আর কোলকাতার কাগজে আলোচিত হতে পারে না, কারণ কোলকাতার নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। আমাদের সাময়িকী আমাদের নিজেদের জন্ম দিতে হবে এবং আমাদের লেখক নিজেদের সৃষ্টি করতেই হবে। প্রথমদিকে হয়তো আমাদের লেখকেরা অপূর্ণ থেকে যাবেন। প্রচেষ্টা আন্তরিক এবং শক্তিমন্ত হলে সে অভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে। নবজন্মের সময় সব দেশে তো এমন হয়েছে।

[আহমদ ছফার 'সাম্প্রতিক বিবেচনা : বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' বই থেকে নির্বাচিত অংশ]

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভাষাসৈনিক
প্রতিভা মুৎসুদ্দি

স্লোগান দিতে থাকেন। এই খবর শুনে আমি অবাক হয়ে যাই। তখন মহামুনি অ্যাংলো পালি ইনস্টিটিউশনে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। খবরটা শুনে আমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায়। এ সময়ই জানতে পারলাম, বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেবপ্রিয় বড়ুয়া মহামুনি স্কুলে এসে আমাদের সংগঠিত করেন। ১৯৪৮ সালেই আমি ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পড়ি। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ হই।

তখন থেকে সক্রিয়ভাবে ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হলেন?

প্রতিভা মুৎসুদ্দি : ১৯৫১ সনে আমি চট্টগ্রাম কলেজে আইএ ক্লাসে ভর্তি হই। তখন আমি সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হই। একইসঙ্গে সক্রিয়ভাবে ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হই। পাকিস্তান সরকার যে ঔপনিবেশিক শাসনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে সব দিক থেকে বঞ্চিত করছে, সে সম্পর্কে আরো সজাগ হই। মূলত কলেজ জীবনে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করি।

আপনারা কেমন করে ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করেছিলেন?

প্রতিভা মুৎসুদ্দি : দুপুরে ঢাকার ছাত্রদের ওপর গুলি চালানো এবং ছাত্রমৃত্যুর খবর শুনে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরা পাগল হয়ে ওঠে। মিছিল বের করে। ছাত্রীদের একটি ট্রাক ভাড়া করে দেয়া হয়। বালিকা স্কুলগুলোতে গিয়ে স্লোগান দিয়ে ছাত্রীদের স্কুল থেকে বের করে আনি। সারাদিন এভাবে কাটে। সারা চট্টগ্রামের মানুষ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব কেমন পড়েছিল?

প্রতিভা মুৎসুদ্দি : কবি মাহবুব উল আলম চৌধুরী 'কাঁদতে আসিনি—ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতাটি লেখেন। তাঁর বন্ধু হারুনুর রশীদ ২৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লালদিঘী মাঠের এক বিশাল প্রতিবাদ সভায় এই আগুনঝরা কবিতাটি পাঠ করেন। ওই বিশাল জনসভায় চট্টগ্রামের নানা রাজনৈতিক দলের বড় বড় নেতারাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন—এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। আমরা মেয়েরাও মিছিল নিয়ে সেই প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম।

ভাষাসৈনিক হিসেবে স্বীকৃতি পাননি এমন কারো কথা কি বলতে পারেন?

প্রতিভা মুৎসুদ্দি : দেবপ্রিয় বড়ুয়া, সুলেখা সাহা, নমিতা, লায়লা, সুপ্রভা, সুনীতি, ফরিদা প্রমুখ। এঁরা স্বীকৃতি পায়নি।

৫২ পরবর্তী ঘটনাবলির কথা কতটুকু স্মরণে আছে?

প্রতিভা মুৎসুদ্দি : ১৯৫৪ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ১৯৫৫ সালে সরকার ৯২A ধারা জারি করে, যাতে ২১ ফেব্রুয়ারি শোভাযাত্রা, সভা-সমিতি করতে না পারে। আমাদের সাবসিডিয়ারি পরীক্ষার্থীদের শহিদ দিবসের মিছিল বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগ না দেবার সিদ্ধান্ত হলো। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এলাকা জুড়ে তল্লাশি, ধরপাকড় আরম্ভ করলে আমাদের রেসিডেন্সে খবর আসে। আমরা সবাই তখনই একযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। রাস্তার দুপাশে সশস্ত্র সেনা। তাদের মধ্য দিয়ে আমরা আমতলার সভায় পৌঁছালাম। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশের লাঠিচার্জ শুরু হলো। ওই দিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে গ্রেফতার করে। এর পরের বছর পাকিস্তান সরকার বাংলাকে 'দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

আপনিও গ্রেফতার হয়েছিলেন?

প্রতিভা মুৎসুদ্দি : হ্যাঁ, ওই দিন, অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ৯২A ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করার সময়ে মিছিল থেকে গ্রেফতার হই। দুসপ্তাহের কারাবাসের পর মুক্তি পাই। ওই দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন ছাত্রী গ্রেফতার হয়। এ ছাড়াও মিটফোর্ড হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ থেকে ২২ জন ছাত্রীকে গ্রেফতার করে।

তারপর ডাকসুতে...

প্রতিভা মুৎসুদ্দি : ১৯৫৪ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। তৎকালীন সবার প্রিয় ছাত্রনেত্রী হিসেবে ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে ডাকসুতে মহিলা মিলনায়তন সম্পাদিকা নির্বাচিত হই। ১৯৫৬-৫৭ শিক্ষাবর্ষে রোকেয়া হলের (তৎকালীন উইমেন্স হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম সহ-সভানেত্রী নির্বাচিত হই।

অমর একুশে বইমেলা ২০২৬

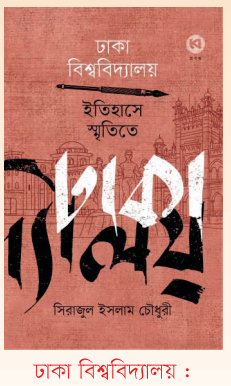
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাসে স্মৃতিতে
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
মূল্য : ৩৮০৳

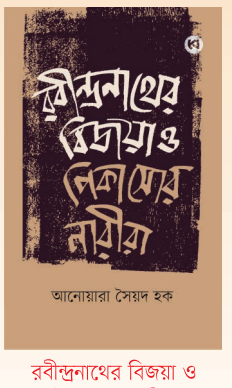
রবীন্দ্রনাথের বিজয়া ও পিকাসোর নারীরা
আনোয়ারা সৈয়দ হক
মূল্য : ৩৫০৳

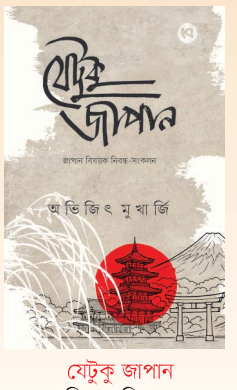
যেটুকু জাপান
জাপান বিষয়ক নিবন্ধ-সংকলন
অভিজিৎ মুখার্জি
মূল্য : ৩৫০৳

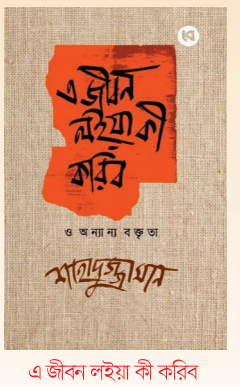
এ জীবন লইয়া কী করিব ও অন্যান্য বক্তৃতা
শাহাদুজ্জামান
মূল্য : ৩৯৮৳

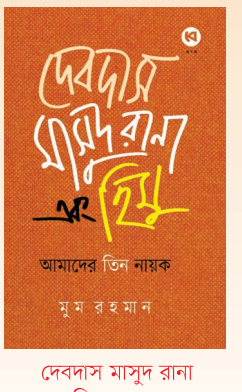
দেবদাস মাসুদ রানা এবং হিমু : আমাদের তিন নায়ক
মুম রহমান
মূল্য : ২৮০৳

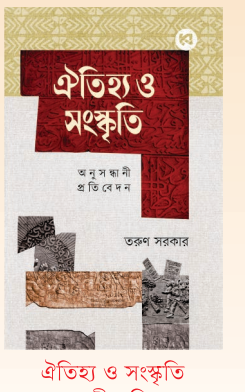
ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি
অনুসন্ধানী প্রতিবেদন
তরুণ সরকার
মূল্য : ৩৫০৳

বেঙ্গলবুকস প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধের বই

বেঙ্গলবুকস

স্টল নম্বর
৬১৭-৬১৮-৬১৯-৬২০-৬২১

+8801958519882, +8801958519883 /bengalbooks.com.bd www.bengalbooks.com.bd

গল্প

পাখিদের একুশে

অলংকরণ : রাজীব দত্ত

রফিকুর রশীদ

পাখিটার যেন ব্যস্ততার অন্ত নেই। তার গায়ের রং সাদা-কালোয় মিশেল দেয়া। কালো বলতে একেবারে কুচকুচে কালো, মেঘ কালো আঁধার কালো। সাদাটুকু স্রেফ ধবধবে সাদা, চৈতী চাঁদের মতো, হাস্নাহেনা ফুলের মতো। রঙের বৈপরীত্যে মানিয়েছে বেশ। যেন-বা গায়ে তার ডোরাকাটা জামা। নাম তার দোয়েল। বাংলাদেশের মানুষ বলে জাতীয় পাখি। কতশত পাখির মধ্যে সে আলাদা।

দোয়েল পাখি লেজ নাচিয়ে গেয়ে ওঠে—সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি। হঠাৎ সে ডান দিকের ডানার তলে ঠোঁট গুঁজতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, চোখ সরু করে তাকায়। খুব কাছেই অন্য একটি ডালে বসে আছে একঝাঁক অচেনা পাখি। বিদেশি সাহেব-সুবোর মতো চেহারা। হ্যাঁ, অচেনাই তো মনে হচ্ছে। ওই যে একেবারে সামনেরটা, ওটা কি মেমসাহেব নাকি! এক লাফে দোয়েল একটু এগিয়ে যায় ওদের কাছে। খুব কাছের একটা ডালে বসে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কারা? মেমসাহেব মতো পাখিটা বলে, আমরা তো ভাই বিদেশি পাখি। শীত এলেই আমরা আসি তোমাদের দেশে। প্রতিবছরই আসি।

অ। তোমরা তাহলে আমাদের অতিথি।

হ্যাঁ, তা বলতে পারো।

বাঙালি অতিথিপরায়ণ জাতি। নিশ্চয় তোমাদের অসম্মান হবে না।

দলছুট এক অতিথি পাখি শহীদ মিনারের মাথার ওপরে উড়তে উড়তে ঘুরতে ঘুরতে এসে দলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। মেমসাহেব পাখিটা তাকে শুধায়, কোথায় ছিলিরে এতক্ষণ? দলছুট পাখি একটু দম নিয়ে বলে, ওই তো ওখানে। শহীদ মিনার দেখছিলাম। মেমসাহেব পাখি জিজ্ঞেস করে, শহীদ মিনার কাকে বলে জানিস?

ওই যে শহীদ মিনার।

ওর মধ্যেই মা আছে, দু'পাশে সন্তান আছে, জানিস এসব?

তা তো জানি না।

তাহলে আর উড়ে উড়ে কী দেখলি তুই?

মানুষ দেখলাম। হাজার হাজার মানুষের মিছিল। শত শত ফুলের মালা। আহা, ওপর থেকে উড়ে উড়ে দেখার মজাই আলাদা।

মেমসাহেব মুখ ভেংচিয়ে বলে, তোর তো সব কিছুতেই মজা। আজ এখানে কেন এত মিছিল, কেন এত ফুলের মালা, সেই কথাটা বল দেখি!

না, দলছুট পাখির মুখে কোনো কথা নেই। অকারণেই দু'বার পাখা ঝাপটায়। দোয়েল এবার এগিয়ে এসে বলে, আহা, ওকে এত ধমকাচ্ছ কেন ভাই? সে সব কথা তো এই আমাদের মধ্যেই অনেকে মনে রাখে না।

তাই নাকি?

তবে আর বলছি কী! সেই ১৯৫২ সালের কথা ক'জনই বা ঠিকমতো জানে! মায়ের মুখের ভাষার জন্য তেমন লড়াই পৃথিবীর আর কোথাও হয়েছে কোনো কালে? এই দেশে হয়েছে।

ভাষার জন্য লড়াই?

বিদেশি অতিথি পাখিদের মধ্যে একজন অতি উৎসাহে মুখ বাড়িয়ে দেয়। আপনমনেই বলে, ভাষা তো এমনিতেই পাওয়া যায় মায়ের মুখ থেকে। তার জন্য আবার লড়াই কীসের?

দোয়েল পাখি হেসে ওঠে ফিক করে। তারপর পাখা নেড়ে বলে, ঠিক বলেছ ভাই, মাতৃভাষা মায়ের কাছে থেকে এমনিতেই পাওয়া যায়। সবাই তা-ই পায়। কিন্তু...

কিন্তু কী! এ দেশের মানুষ কি তা পায়নি?

পেয়েছে। কিন্তু এ দেশের মানুষের মাতৃভাষা চর্চার অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল পাকিস্তানিরা।

তাই নাকি!

এ দেশের মানুষকে তাই মাতৃভাষার মর্যাদার জন্য লড়তে হয়েছে। পুলিশের গুলিতে মরতে হয়েছে।

গুলিতে মরার কথা শুনে দেশি-বিদেশি অনেক পাখির বুক কেঁপে ওঠে। তাদের কণ্ঠে ঝরে পড়ে বিস্ময়, বলো কী! ভাষার জন্য মৃত্যু?

হ্যাঁ, তাই। বাংলা ভাষার দাবি জানাতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে রফিক শফিক সালাম বরকত-সহ আরো অনেকে। এ দেশে তাদের বলে ভাষাশহিদ। সেই শহিদদের স্মৃতি জাগিয়ে রাখতেই বাঙালি গড়েছে শহীদ মিনার।

মেমসাহেব পাখি বলে, বাব্বা, তুমি এত জানো! ও, তাই বুঝি! সেই থেকে এই শহীদ মিনার।

না না, এটা বায়ান্ন সালের সেই শহীদ মিনার নয়।

দোয়েল পাখি খুব পণ্ডিতের মতো জানায়, তারপর কত ভাঙাগড়া হয়ে গেল। কত যে রক্তপাত আর কত যে অশ্রুজলের মূল্যে পাওয়া এই বাংলাদেশ! সব কিছুর মূলে ওই শহীদ মিনার।

বর্ণনার এই ভঙ্গি দেখে মেমসাহেব পাখি খুব খুশি। আনন্দের সঙ্গে সে বলে, তোমার কাছে ইতিহাসের গল্প শুনতে খুব মজা তো! আরো শোনাও না ভাই!

আচ্ছা, সে একদিন শোনাব না হয়। আজ শুধু শুনে রাখো—বাঙালির ভাষা বাংলা ভাষা তখনকার শাসকেরা বাঙালির মুখ থেকে কেড়ে নেবার জন্য নানান রকম ফন্দি আঁটে। কিন্তু কাজ হয়নি কিছুতেই। বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা মায়ের সোনার ছেলেরা বুকের রক্ত ঢেলে প্রতিষ্ঠা করে মাতৃভাষার মর্যাদা।

গল্পের মাঝখানে মেমসাহেব পাখিটা পাখা ঝাপটিয়ে সহসা বলে ওঠে, ওটা কী হচ্ছে দোয়েল ভাইয়া? শহীদ মিনারের সামনে হাত উঁচিয়ে ওরা সবাই কী বলছে?

দোয়েল পাখি সংক্ষেপে জানিয়ে দেয়, ওরা দেশ গড়ার শপথ গ্রহণ করছে।

এটুকু বলার পর সবাইকে সে আহ্বান জানায়—চলো, আমরাও ওদের মাথার ওপরে ডানা মেলে ছায়া দিই, এই একুশে আমরাও শপথ নিই।

তারপর পাখিরা উড়ে যায়। আপন ভাষার কূজনে ভরিয়ে দেয় আকাশ-বাতাস।

বাংলা ভাষার ঝর্ণা জলে

আহমেদ সাব্বির

বর্ণ দিয়ে শব্দ সাজাই,
বাক্য দিয়ে ভাষা
বাংলা ভাষার ঝর্ণা জলে
মুক্তো মানিক ঠাসা।

অ-আ-ক-খ বর্ণ যখন
মায়ের মুখে ফোটে,
মধুর হাসি ছড়িয়ে পড়ে
সব শিশুরই ঠোঁটে।

গান গেয়ে যায় পাখি তখন
দোল দিয়ে যায় হাওয়া
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
প্রাণের দামে পাওয়া।

গল্প-কথায় ছন্দ-ছড়ায়
গানের সুরে সুরে
ভাষার লড়াই বায়ান্ন সাল
আসে ঘুরে ঘুরে।

ভাষাই লালন টপ্পা ঝুমুর
বাউল জারি সারি
ভাষাই একুশ শহীদ মিনার
ফাগুন-ফেব্রুয়ারি।

প্রভাতফেরির মৌন আলোয়
ভাসাই গানের ভেলা
সাতপুরুষের জন্মভাষায়
বাঁক বদলের খেলা।

বাংলা আমার বুকের ধ্বনি
স্বাধীনতার বাঁশি
'আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি।'

ছড়া

কিন্ডারবুকস প্রকাশিত সচিত্র শিশুতোষ ক্লাসিক

আ লিটল প্রিন্সেস
মূল : ফ্রান্সেস হজসন বার্নেট
অলংকরণ : লুৎফি রুনা
মূল্য : ১৪০৳

দ্য ফ্যান্টম অব দি অপেরা
মূল : গাস্তোঁ লেরু
অলংকরণ : সুবীর মণ্ডল
মূল্য : ১৪০৳

দ্য প্রিন্স অ্যান্ড দ্য পপার
মূল : মার্ক টোয়েন
অলংকরণ : লুৎফি রুনা
মূল্য : ১৪০৳

রবিন হুডের অভিযান
মূল : লোককথা
অলংকরণ : লুৎফি রুনা
মূল্য : ১৪০৳

মায়াবী জাদুর প্রাসাদ
মূল : ইডিথ নেসবিট
অলংকরণ : তাহফিমউল ইসলাম
মূল্য : ১৪০৳

অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড
মূল : লুইস ক্যারল
অলংকরণ : তাসনিয়া অর্ণা
মূল্য : ১৪০৳

স্টল নম্বর ৮১, ৮২ ৮৩

/kinderbooksBD www.kinderbooks.com.bd বই পেতে কল করুন : ০১৯৫৮৫১৯৮৮২, ০১৯৫৮৫১৯৮৮৩

পুনর্পাঠ

আমাদের ভাষা, সাহিত্যের বিকাশে পত্রিকা-সাময়িকী

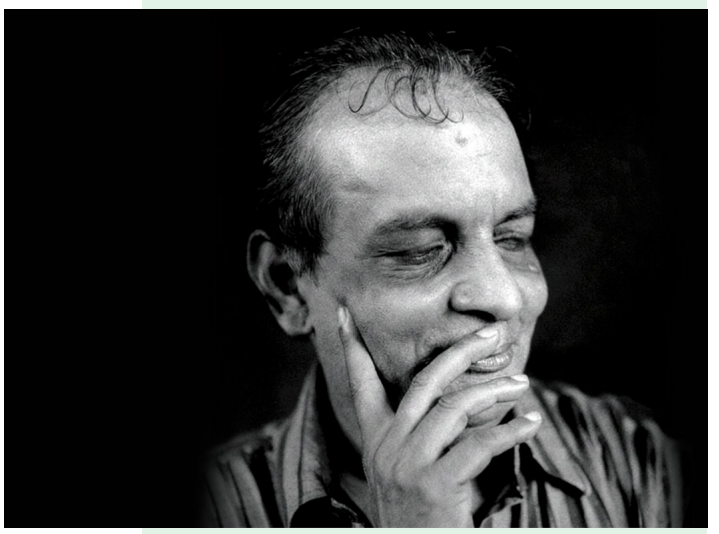

আহমদ ছফা

সমস্ত কিছুর একটা ভিত্তি, একটা অবলম্বন প্রয়োজন। বাংলাদেশের যে নতুন সংস্কৃতির রূপরেখা আভাসিত হয়ে উঠেছে, সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের জনগণের নতুন একটি সংস্কৃতি ক্ষেত্রের দিগন্ত উন্মোচন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে—তার বস্তুভিত্তি কী? সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন এবং অন্যান্য সুকুমার কলা অনুকূল পরিবেশ না পেলে গড়ে উঠতে পারে না। আশা করতে দোষ নেই, বাংলাদেশে অনতিবিলম্বে তেমন একটা পরিবেশ তৈরি হবে। কঠোর বাস্তবের দিকে না তাকিয়ে শুধুমাত্র আশাবাদ দিয়ে কোথাও কিছু ভাল কাজ হয়েছে তেমন প্রমাণ নেই। আমাদেরও বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার প্রয়োজন এসেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে এ রকম দাঁড়ায়, বাস্তব অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, সোজাসুজি না তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই।

সংস্কৃতির বাহন পত্র-পত্রিকা এবং নানারকমের সাময়িকী। আজকে বাংলাদেশে বলতে গেলে কোনও পত্র-পত্রিকা নেই যাতে তীব্র জীবনাবেগ, গভীর প্রাণস্পন্দন, পরিণত চিন্তা কিংবা জনগণের কল্যাণ ভাবনার কোনও চিহ্ন ধারণ করে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। তার ফলশ্রুতি এই হয়েছে, আমাদের এই দেশে মতামতের, ভাবের, অনুভূতির এবং জ্ঞানের চলাচল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। পণ্ডিতসমাজ একেবারে সমাজের সঙ্গে বাস্তব সংযোগহীন হয়ে পড়েছেন। আর পরিণত বুদ্ধি, জীবনের অভিজ্ঞতা এবং প্রগাঢ় জ্ঞানের অভিভাবকত্বে যে নতুন চিন্তার উন্মেষ হয়, প্রবীণের সস্নেহ প্রশ্রয়ে ঋদ্ধ সমালোচনায় তরুণ তার সাধনার যে সার্থকতা অনুভব করে, তা একেবারেই হচ্ছে না। পণ্ডিতেরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, তরুণরা কোনও একটা লক্ষ্য ঠিক করতে পারছেন না বলে অনেক ক্ষেত্রে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েন। কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারেন না। আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলো সামায়িকপত্র থাকলে পণ্ডিতেরা কিছুতেই বিচ্ছিন্ন থাকতে পারতেন না। তাঁদেরকে নেমে আসতে হতো, নানান বিতর্কের সম্মুখীন হতে হতো, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক নানা প্রশ্নে মতামত রাখতে হতো। পণ্ডিতবর্গের মতামতের ওপর নির্ভর করে গোটা সমাজে তর্কের তুফান ছুটত। জাতির মানসহ্রদে ঢেউয়ের পর ঢেউ খেলে যেত। এই দ্বন্দ্বে আমাদের সংস্কৃতির ভারজীর্ণ অংশ খসে পড়ত। শুধু প্রাণটুকু তরুণদের মন-প্রাণ জাগিয়ে তুলত। তারা কল্যাণের, সুন্দরের, সত্যের পথে হেলায় দুরূহ সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারতেন।

সাময়িক পত্র-পত্রিকা বহতা নদীর মতো আর সামাজিকভাবে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের আলোচনা আলো-বাতাসের মতই প্রয়োজনীয়

পাকিস্তান আমলে ঔপনিবেশিক সরকার চাইত না বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার প্রসার হোক, বাঙালি সৃজনশীল কর্মে আত্মনিয়োগ করুক। তা করলে ভয় ছিল, বাঙালি শিল্প-বিজ্ঞানে, সাহিত্য-ইতিহাসে তার জাতির মানসযাত্রার ভঙ্গিটির সঙ্গে পরিচিত হলে একদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। এই আশঙ্কাবশত তারা বাঙালির সাংস্কৃতিক বিকাশ নানান দিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। সেই কারণে পাকিস্তানি আমলে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিধর্মী কোনও সাময়িকপত্রের জন্ম হয়নি। 'সমকাল' জাতীয় যে দুয়েকটা সাময়িকপত্রের দান এ দেশের সংস্কৃতির বিকাশে স্মরণীয় তাও কোনও দিন পাকিস্তানি সরকারের আরোপিত বিধি-নিষেধের পরিপন্থী কোনও চিন্তা-ভাবনা করতে পারেনি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়ার দিক থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কি তৃতীয় পাদ পর্যন্ত বাংলার সব রকমের অগ্রগতির বিষয় স্নিগ্ধ মস্তিষ্কে বিচার বিবেচনা করলে দেখতে পাব বহতা নদীর মত একটা না একটা সাময়িকপত্র জনমতকে শিক্ষিত করছে, নতুন চিন্তাধারার বিকাশ সাধন করছে, নতুন প্রতিভা সৃজন করছে। বাংলার সংস্কৃতির, রাজনীতির, সাহিত্য-বিজ্ঞানের যাঁরা বরেণ্য পুরুষ বলে আমরা মনে করি, এই সকল সাময়িকপত্র না থাকলে তাদের কারো জন্ম হতো না, সে কথা বলাই বাহুল্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর', 'বঙ্গ দর্শন', 'প্রবাসী' থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের 'কল্লোল', 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা বাদ দিলে দেখতে পাব, যাঁদের দানে বাঙালি সমাজ উর্বরা হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা-সাহিত্য, রাজনীতিতে এসেছে বেগ, এই সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলোর পেছনে না তাকালে তাদের জন্ম সম্ভব হতো না।

সাময়িক পত্র-পত্রিকা বহতা নদীর মতো আর সামাজিকভাবে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের আলোচনা আলো-বাতাসের মতোই প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর সব দেশেই দেখা গেছে নতুন যুগের সূচনা হওয়ার সময়ে, নতুন চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করার সময়ে, নতুন সমাজ নির্মাণ

এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠায়

বুক রিভিউ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানার আকরগ্রন্থ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলো বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি কেন্দ্রবিন্দু। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এ দেশের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কারণ একটি বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষাকেন্দ্রই নয়—একটি বিশ্ববিদ্যালয় হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের ঢাল, একটি সাংস্কৃতিক অঙ্গন এবং দেশ ও জাতির জন্য একটি খোলা পাঠ্যক্রম।

'বেঙ্গলবুকস' প্রকাশিত লেখক, সম্পাদক ও ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাসে, স্মৃতিতে' বইটি হতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জানার একটি অসাধারণ মাধ্যম।

এই বইটি শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস নয়—এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, বিকাশ এবং সমাজ ও রাজনীতিতে তার ভূমিকা নিয়ে এক গভীর বিশ্লেষণ।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : ইতিহাসে, স্মৃতিতে' প্রবন্ধ সংকলনে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী দেখিয়েছেন—কীভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতি একসঙ্গে এই বিদ্যাপীঠের অভ্যন্তরীণ জীবন এবং বাইরের সমাজ ও মানুষকে প্রভাবিত করেছে। বইটিতে রয়েছে মোট ৯টি প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে লেখক নিজের ব্যক্তিগত স্মৃতি ও ঐতিহাসিক তথ্যকে তুলে ধরেছেন স্পষ্ট ভাষায়।

বইটির প্রতিটি প্রবন্ধ থেকেই জানার আছে অনেক কিছু। সব প্রবন্ধ নিয়ে আলাদা করে বলা সময়সাপেক্ষ, লিখতে গেলে 'সীমিত শব্দসংখ্যা'র কথাটিও মাথায় রাখতে হয়। তবু 'মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা' এবং 'একাত্তর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'—এই দুটি প্রবন্ধ আলাদা করে উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধ ছিল সাধারণ মানুষের যুদ্ধ। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে অংশ নিয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পরিকল্পিত গণহত্যার শিকার হয়ে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই দেশ মুক্তি পেয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল হানাদার বাহিনীর অন্যতম লক্ষ্যবস্তু। শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদের নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই প্রবন্ধগুলোতে সেই ইতিহাস উঠে এসেছে স্পষ্টভাবে। একই সঙ্গে বোঝা যায়—প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে বাংলাদেশের সব গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। 'মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা' প্রবন্ধে লেখক লিখেছেন—'ইতিহাস-পাঠকালে জিজ্ঞাসা থাকে এটাও যে স্বাধীন হয়েও আমরা যে মুক্ত হতে পারলাম না, সেই সমস্যার সমাধান কী? অর্থাৎ মুক্তি আসবে কোন পথে? কোন পথে এগোলে সাধারণ মানুষের দুঃখ ঘুচবে? জবাবটাও পাওয়া যাবে আমাদের ইতিহাসের মধ্যেই।' আর ঠিক এ কারণেই ইতিহাস জানা জরুরি। আর সেই ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই বইটি কি শুধু ইতিহাসের বই? না। এটি স্মৃতির বইও। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর স্মৃতির পাতা থেকেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তুলে ধরেছেন। তাদের ভূমিকার কথা, মধুদার কথা এবং আরও অনেক প্রসঙ্গ। বইটি পড়তে পড়তে পাঠক হারিয়ে যায় ইতিহাস ও স্মৃতির ভেতরে। আর প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে দেওয়া তথ্যসূত্র পাঠককে আরও পড়ার দিকে, ইতিহাসকে আরও গভীরভাবে জানার পথে আহ্বান জানায়।

—নীলিমা রশীদ তৌহিদা, ঢাকা

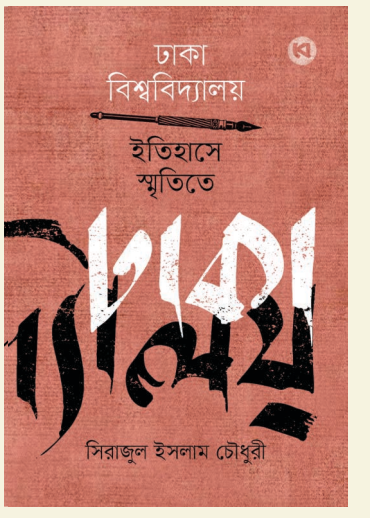

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইতিহাসে, স্মৃতিতে
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
প্রকাশক : বেঙ্গলবুকস
মূল্য : ৩৮০৳

শেষ পৃষ্ঠার পর

ভাষার ভিত্তিতে আসলে ...

এখানে ভাষাকে নিয়ে যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণের চেয়ে আবেগ বেশি দেখা যায়। যেমন, অনেকেই দাবি করেন বাংলা একটি শুদ্ধ-পবিত্র ও সুন্দর ভাষা। এখন যখনই কেউ এমন দাবি করেন, তখন ধরেই নিতে হয় এমন কিছু ভাষাও আছে, যেগুলো 'অশুদ্ধ-অপবিত্র-অসুন্দর'। অথচ ভাষাবিজ্ঞান তো এই বিভাজন স্বীকার করে না।

কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনও ভাষাকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আবেগের প্রাধান্য বেশি থাকে।

ভাষার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আবেগের প্রভাব বেশি—এই বিষয়টিকে যদি ব্যাখ্যা করতেন?

শিশির ভট্টাচার্য্য : দেখুন, প্রতিবছর যখনই ফেব্রুয়ারি মাস আসে, তখন সারাদেশেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে দৃশ্য, পাঠ্য ও শ্রাব্য মিডিয়ায় অনেক কাজ দেখতে পাওয়া যায়। খোদ বইমেলাই এ সময় সবচেয়ে বড় আয়োজন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অনেকেই অভিযোগ করছেন, তারা অতীতের সেই ভাষার ফেস্টিভ আবহের জৌলুসটুকু দেখতে পাচ্ছেন না। এখানে ভাষাকে নিয়ে যুক্তিভিত্তিক বিশ্লেষণের চেয়ে আবেগ বেশি দেখা যায়। যেমন, অনেকেই দাবি করেন বাংলা একটি শুদ্ধ-পবিত্র ও সুন্দর ভাষা। এখন যখনই কেউ এমন দাবি করেন, তখন ধরেই নিতে হয় এমন কিছু ভাষাও আছে, যেগুলো 'অশুদ্ধ-অপবিত্র-অসুন্দর'। অথচ ভাষাবিজ্ঞান তো এই বিভাজন স্বীকার করে না। সব ভাষাই আসলে শুদ্ধ-পবিত্র-সুন্দর হবার কথা। প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো ভাষা শুদ্ধ-পবিত্র-অসুন্দর—এমন ধারণার ক্ষেত্রে মানদণ্ড আসলে কী? মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ভাষাই কারও না কারও মাতৃভাষা। 'মাতৃভাষা' বাংলা যদি সুন্দরী হয়ে থাকে, তবে 'ধাত্রীভাষা' ইংরেজি বা ফারসিও কুরূপা-কুৎসিত হবার কোনো কারণ নেই। তবে যেহেতু বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, তাই আমাদের বাংলাকে কেন্দ্র করেই অন্য ভাষার তুলনামূলক আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে।

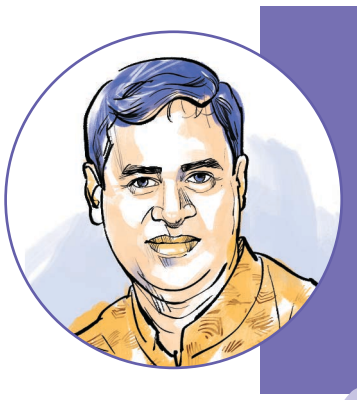

এ ক্ষেত্রে আলোচনাটুকু কেমন হওয়া উচিত? ফেব্রুয়ারি মাস এলেই আসলে অনেকে আবেগের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বলেন, ভাষার দূষণ ঘটছে। বাস্তবে, ভাষাদূষণ বলে কিছু ঘটে না। কারণ, ভাষা পুরোপুরি জীবন্ত। এজন্য ভাষাকে শুধু আবেগ দিয়ে বিচার করলে চলবে না। ভাষাকে তার নিজের মতো চলতে দিতে হবে। এ বিষয়ে আমি বহু প্রবন্ধে লিখেছি, ভাষা শুধু আবেগেরই নয়, এটি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিকও বটে। আর এই বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, ভাষাকে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ থেকেও বিচার করতে হবে।

আমরা প্রায়ই বলি, বাংলা ভাষা বা অন্য যেকোনো ভাষার প্রভাব সংস্কৃতিতেও পড়ে। এজন্য টিভি, সিরিয়াল ও সংবাদপত্রের ভাষাকে নিয়ে কিছু সমালোচনা থাকে। বলা হয়, ভাষাদূষণের জন্য এফএম রেডিও বা টেলিভিশনের নাটক-সিরিয়াল দায়ী। রেডিও শুনে বা টেলিভিশন দেখে কেউ ভাষা শেখে না। রেডিও বা টেলিভিশন সেই ভাষাই ব্যবহার করে, যে ভাষায় শ্রোতা বা দর্শক কথা বলে। এফএম রেডিওর পক্ষে বাংলা ভাষা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এখানে যা হচ্ছে তা ভাষাদূষণ নয়, ভাষামিশ্রণ। আবার সাহিত্যে যেভাবে ভাষার ব্যবহার হয় সেটি সর্বোপরি পাঠকের, বুদ্ধিজীবীর ও চিন্তকদের ক্ষেত্রেই বেশি কার্যকর বলে মনে হয়। এখানেও মিশ্রণ ঘটে। আমার এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে ভিন্নমত অবশ্যই রয়েছে। তবে আমি এভাবেই দেখি।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্ন চলে আসে। ভাষার বিকাশে অন্য ভাষার শব্দের প্রভাব রয়েছে। এর নিরিখে বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

শিশির ভট্টাচার্য্য : দেখুন, যেকোনো ভাষাকে নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে হয়। নতুন অর্থে পুরোনো শব্দ ব্যবহার করতে হয় এবং অন্য ভাষা থেকে ঋণ নিতে হয়। বাংলা এককালে সংস্কৃত, ফারসি, আরবি থেকে ঋণ নিয়েছে, এখন নিচ্ছে ইংরেজি থেকে। এ ক্ষেত্রে কোনো নিষ্ঠাবান পণ্ডিত ভাবতে পারেন, 'হাওয়া', 'খুন', 'সিন্দুক'-এর মতো শত শত আরবি-ফারসি শব্দ ঢুকে বাংলা ভাষাকে 'অপবিত্র' করেছে। আবার কোনো বুজুর্গ বিশ্বাস করতে পারেন, 'বেদি', 'স্নাতক', 'লক্ষ্মী'র মতো হাজার হাজার সংস্কৃত শব্দ ঢুকে বাংলা ভাষাকে 'নাপাক' করে দিয়েছে। এসব ধারণা ভাষাবিজ্ঞানী হিসেবে নিছক কুসংস্কার বলে মনে করি। অন্য ভাষা থেকে শব্দ নিলে যদি ভাষা কলুষিত হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে আরবি, সংস্কৃতসহ সব ভাষাই কমবেশি কলুষিত। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ-শামসুর রাহমান-জগদীশ চন্দ্র-রোকেয়া যে ভাষায় লিখেছেন তাতেও প্রচুর বিদেশি শব্দ ছিল। কিন্তু এসব বিদেশি শব্দের উপস্থিতি তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টিতে কোনো ব্যাঘাত ঘটিয়েছে—এমন অভিযোগ কেউ করেননি।

আমি মনে করি, ভাষাকে দুই একজন নগর পরিকল্পনাকারীর সচেতন নির্মাণ হিসেবে ভাবা সম্ভব নয়। বরং বলা যায়, ভাষা গ্রামের আঁকাবাঁকা মেঠোপথের মতো বহু মানুষের অসচেতন নির্মাণ। কোনো একক মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর পক্ষে সচেতনভাবে তার ভাষাকে বদলানো সম্ভব নয়। ভাষা এমন একটি সিস্টেম বা সংশয়, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলায়। বিভিন্ন কারণে একটি ভাষার মধ্যে বহু লক্ষ 'বিদেশি' শব্দ এসে ভাষাটিকে প্রবহমান, জীবিত রাখে। এতে ভয়ের কিছু নেই। স্বাগতিক ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' শব্দগুলোর উচ্চারণ এমনভাবে বদলে নেয় যে শব্দগুলো আর বিদেশি থাকে না। আমরা দেখছি, আজ বাংলা ভাষায় বন্যার জলের মতো ইংরেজি শব্দ ঢুকছে। এমনটি ইতিবাচক বলেই দেখি। বাংলা ভাষায় এখন অনুবাদের জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করেছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নতুন ভাষা শেখার আগ্রহও প্রবল হতে শুরু করেছে। বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মেই সেগুলো বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দসম্পদ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের একটি নিজস্ব বাংলা ভাষারীতি প্রয়োজন। এই ভাষারীতির নিরিখে সরকারিভাবে বাংলা ভাষার প্রচার-প্রসারে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা জরুরি। এই কাজটি শুধু বইমেলা বা ফেব্রুয়ারি মাস এলেই করলে হবে না। ভাষার বিকাশে সংবাদমাধ্যম, প্রকাশনা এবং সাহিত্য অঙ্গনের আলাদা আলাদা ভূমিকা রয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও অধ্যাপনা ও গবেষণার আলাদা ভূমিকা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আন্তঃসমন্বয় এবং তুলনামূলক আলোচনার পরিসর বছরব্যাপী করতে হবে।

অর্থাৎ বাংলা ভাষার প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে আপনি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাকে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা বলে দেখেন?

শিশির ভট্টাচার্য্য : কিছুটা অবশ্যই। এ বিষয়টিকে সরলভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন। সাংবিধানিকভাবে বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা। সমস্যা হলো, এটা আইনগত হলেও কার্যত নয়।

সাক্ষাৎকারটির বাকি অংশ পড়তে স্ক্যান করুন

পাঠলিপি থেকে

প্রথম প্রেমের শৈল্পিক বয়ান

মে ২

আজ আবার কেঁপে জ্বর এলো। শরীরের শিরার ভেতর দিয়ে ঠান্ডা একটা প্রবাহ যেন এঁকেবেঁকে পথ করে যাচ্ছে। আমার মনেও কিছু একটা মোচড় দিয়ে উঠছে, আবার প্রসারিত হচ্ছে—এমন যেন হঠাৎ একটা ঝরনাধারা গা-ঝাড়া দিয়ে আলগা হয়েছে, যেন কপালের পেছনে কোনো অবাধ্য ভাবনা ভয়ানক তেজে জট খুলে বেরোতে চাচ্ছে।

ওর দেহের বাসনা এখনো আমার চারপাশে ভুরভুর করছে, যদিও ক্রমে তা ক্ষীণ আর হালকা হয়ে মরেও যাচ্ছে। আমার মাংস থেকে তা চুইয়ে চুইয়ে পড়ে আমার আত্মাকে মাতাল করে তুলছে। কেউ একজন আমাকে ঠেলছে, যেন ওর পেছন পেছন ছুটে যাই ওকে বলতে যে সে যেন ফিরে এসে আমার জানুদেশে বসে এবং আবার আমার ঠোঁটে ঠোঁট মেলায়।

আমার চোখে ভাসে লাল একজোড়া ঠোঁট, ঠোঁট তো নয় যেন বড় বড় দু'ফোঁটা রুধির। আর আমি যখন চুমু খাওয়ার জন্য উবু হই, তখন এক বুনো আবেগ এবং মানুষখেকোদের যুগ থেকে ভেসে আসা গুড়গুড় ধ্বনি আমার ধমনির ভেতর দিয়ে বয়ে যায়; আর আমি শিউরে উঠি। মনে হয়, আমি মেয়েমানুষের মাংসে মুখ বসিয়ে রক্ত চুষছি।

মে ৩

আজ মনটা অনেক শান্ত। আজ সন্ধ্যায় সে আসছে না। ওকে চাই কাছে, আবার ভয়ও করি। ওর জন্য কী অদ্ভুত এক অনুভূতি কাজ করে; ওর ওই লিকলিকে শরীর আর বিশাল আয়ত দুটো চোখ, আর ওই লাল, রক্তে লেখা ঠোঁট দুটো।

একদিন রাতের বেলা শহরের বাইরে একটা বাগানে আমি বিষণ্ন মনে বসেছিলাম। মনে হচ্ছিল, কারও জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তখন মুখ ফেরাতেই দেখি, সে। মিষ্টি হেসে গাছপালার নিচ দিয়ে এগিয়ে আসে। একটা অদৃশ্য হাত যেন আমাকে ঠেলা দেয়। হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে আছে, একটা সর্বকর্মা হাত আমাকে ধাক্কা দিয়েছিল। আমি ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে নিজের নাম বলি—এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পীর নামই বলি—এবং ওকে জিজ্ঞেস করি, সে আমার ছবির মডেল হতে ইচ্ছুক কি না।

আমি ওর প্রেমে পড়ি, সেও পড়ে আমার প্রেমে। সেই সনাতন, সেই সর্বজনীন মেলবন্ধনের গান।

আর এখন আমি চাই তার শরীর, তার বিশাল আয়ত চোখ আর রক্তে ভেজা ওষ্ঠ যেন বারবার আসে, বারবার এসে উপগত হয় আমার ওপর, যেন আশীর্বাদের আতঙ্ক আর মদিরা দিয়ে আমার ঘর সে ভরতেই থাকে। তার বাসনার বিবশ করা মারাত্মক আদুরে স্পর্শে যেন স্নায়ুগুলোকে অবশ করতে এবং দেহকে নিঃসাড় করতে থাকে। আমার দেহের যেসব অঙ্গে সে চুমু খায়, দিনের পর দিন সেখানে আমি ব্যথা অনুভব করি, মনে হয় যেন দেহের ওইসব অঙ্গ ঝলসে গেছে। ওর ঠোঁট থেকে বিষাক্ত এক মিষ্টি স্বাদ আমার ভেতর চুইয়ে পড়ে আমার সব যুক্তিতর্ক, সব মাংসপেশি অবশ করে দেয়।

সে চলে গেলে আমি যখন আবার আঁকতে বসি, তখন আমার হাত থেকে আজব প্রাচীন সব আঁকিবুঁকি লাফিয়ে পড়ে, আলো আর ছায়া আর ঘোরগ্রস্ত রংরাজির উন্মাতাল মিলন ঘটে। অসীম, স্থির জলধি, আজগুবি মেঘখণ্ড আকাশ জুড়ে ছুটে বেড়ায়, তারা দিগন্তপারে নেমে যায় আর ড্যাবড্যাবে খেয়ালি সূর্যকে ছায়াচ্ছন্ন করে ফেলে...।

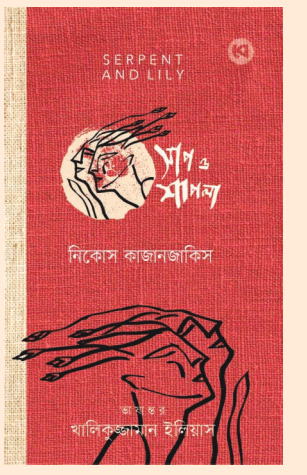

সাপ ও শাপলা

নিকোস কাজানজাকিস

ভাষান্তর : খালিকুজ্জামান ইলিয়াস

প্রচ্ছদ : আজহার ফরহাদ
ধরন : অনূদিত উপন্যাস
প্রকাশক : বেঙ্গলবুকস

সাড়ে তদিনের প·ত্রি·কা

বর্ষ ৪ । সংখ্যা ১ । বৃহস্পতিবার । ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ । ১৩ ফাল্গুন ১৪৩২

ভাষা খামখেয়ালি,
তার শব্দ-নির্বাচন নিয়ে
কথা-কাটাকাটি করা বৃথা

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিশ্বকবি

ভাষাসৈনিক

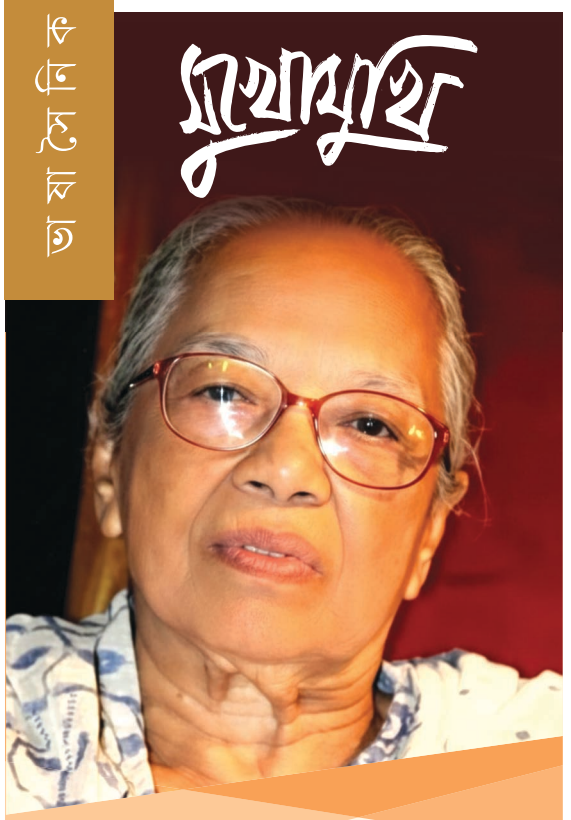

> ছাত্রদের ওপর গুলি চালানো এবং মৃত্যুর খবর শুনে ছাত্র-ছাত্রীরা পাগল হয়ে ওঠে

প্রতিভা মুৎসুদ্দি

ভাষাসংগ্রামী, শিক্ষাবিদ প্রতিভা মুৎসুদ্দির জন্ম ১৯৩৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর, চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার মহামুনি পাহাড়তলী গ্রামে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, ভাষার দাবিতে আন্দোলিত সময়ে বেড়ে উঠেছেন প্রতিভা মুৎসুদ্দি। পারিবারিক মূল্যবোধ ও সময়ের এ মহার্ঘ্য প্রতিভা মুৎসুদ্দির শিক্ষা এবং মননের বিকাশকে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০০২ সালে তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

এই ভাষাসৈনিকের সাক্ষাৎকার যখন আমরা গ্রহণ করি, তখনও তিনি কর্মচঞ্চল। এখনও প্রতিদিন কোনো না কোনো অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকেন। স্মৃতিশক্তি এখনও প্রখর। ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মনে হয়েছে, তিনি ফিরে গিয়েছিলেন সেই ৪৮, ৫২'র অগ্নিঝরা দিনে। কথা বলেছেন—**কুমার প্রীতীশ বল**

আপনি কীভাবে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ হলেন?

প্রতিভা মুৎসুদ্দি : ১৯৪৮ সনে ফেব্রুয়ারি মাসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকা পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা No No বলে

এরপর ৪র্থ পৃষ্ঠায়

। সাক্ষাৎকার ।

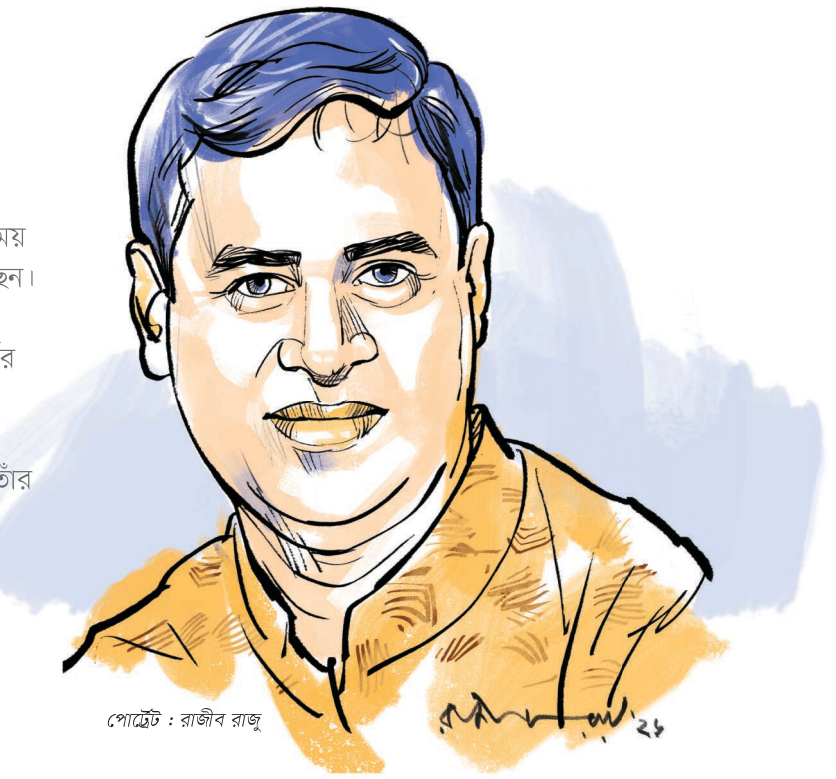

শিশির ভট্টাচার্য্য একাধারে একজন ভাষাবিজ্ঞানী, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি ব্যাকরণচর্চা নিয়ে কাজ করছেন। ব্যাকরণচর্চার বাইরেও বাংলা ভাষার সংকট, বাংলার প্রচার-প্রসার ও উৎকর্ষের বিষয়ে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে—*যা কিছু ব্যাকরণ নয়, বাংলা ভাষা প্রকৃত সমস্যা ও পেশাদারী সমাধান, অধিবর্ষে ভাষা ভাবনা* ইত্যাদি। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন **আমিরুল আবেদিন আকাশ**

পোর্ট্রেট : রাজীব রাজু

ভাষার ভিত্তিতে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা সহজ নয়

—ড. শিশির ভট্টাচার্য্য

আপনাকে আমরা ভাষাবিজ্ঞানী, চিন্তক বলেই অনেক বেশি চিনি। আপনার দীর্ঘ কর্মজীবনে আপনি ভাষাকে আয়ত্ত করতে চেয়েছেন। আপনার কাজের পরিধিও এই ভাষাকেই কেন্দ্র করে। একাডেমিয়ার নিরিখে আপনি ভাষাকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেন?

শিশির ভট্টাচার্য্য : এ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আলোচনা অনেক বড় হয়ে যাবে। তাই সংক্ষেপেই বলি। হ্যাঁ, ভাষা নিয়েই আমার কাজ। প্রকৃতপক্ষে আমি একজন ভাষাবিজ্ঞানী। তবে শুধু ভাষাবিজ্ঞানী পরিচয়টি দিয়েই আমার কাজকে মূল্যায়িত করা কঠিন। কারণ, বুদ্ধিবৃত্তিক জায়গার পাশাপাশি আমাকে সৃজনশীল রচনার দিকেও মনোযোগ দিতে হয়। সেক্ষেত্রে ভাষাকে আমি সংস্কৃতি, রাজনীতি, কাঠামোগত, আর্থ-সামাজিক—এসব পরিসরেই ব্যাখ্যা করে এসেছি। এ নিয়ে আমার একাধিক বইও রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক হিসেবে আমাকে একাধিক ভাষা নিয়ে কাজ করতে হয়। তবে আমি সবসময়ই বাংলা ভাষার প্রচার-প্রসার নিয়ে কাজ করতে চেয়েছি। বিশ্বায়নের এই যুগে একটি ভাষার ভিত্তিতে আসলে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ নয়। কিন্তু আলোচনার ভিত্তিভূমি আমি সবসময়ই বাংলা ভাষাকেই করে থাকি। ভাষা নিয়ে একাডেমিয়ায় আমার যে ধারণা, সেখানে ভাষার গাঁথুনির মধ্যে যুক্তিকেই আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি।

এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

ভাষার মানসিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক দিক

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

ভাষা জ্ঞানের একটা অমূল্য শাখা। এটি এতই বিশাল, এর ব্যাপ্তি এত বিস্তৃত যে একমাত্র ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরাই এটিকে বুঝতে পারবেন। আমরা ভাষাকে টেক্সট বলি।

ভাষাকে নিয়ে কাজের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছি আমি। যখনই ভাষার মাসের প্রসঙ্গ আসে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন দেখা দেয়। অনেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, আমরা আসলে কী নিয়ে কাজ করি। আমাদের কাজের পরিসর কতটা বিস্তৃত।

ইউনেস্কোর মতে, একটি ভাষা তখনই হারিয়ে যায়, যখন সেই ভাষায় কথা বলার লোক হারিয়ে যায় কিংবা তারা অন্য ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। ইউনেস্কোই বলছে, 'সামরিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা শিক্ষামূলক পরাধীনতার মতো বাহ্যিক চাপ এবং কোনো সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষার প্রতি নেতিবাচক মানসিকতার মতো অভ্যন্তরীণ চাপের কারণে বিশ্বের অনেক ভাষা হুমকির মুখে।' এই হুমকি থেকে মুক্তি পাওয়ার একটিই উপায়, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ভাষাকে নিয়ে কাজ করা। এই একটি উদ্দেশ্যে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞান নামে একটি বিষয় পেয়েছি। আবার এই ভাষাকে চর্চা করার কাজটি করে আরেকটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সেটিই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। এটি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও।

আমরা লক্ষ করি, ফেব্রুয়ারি মাস এলেই ভাষাকে নিয়ে একধরনের হতাশা সবার মধ্যে জাগে। অনেকে বলেন, সারা বছর তাহলে কথা হয় না কেন? একটি প্রকাশনী সারাবছরই বই প্রকাশ করে। কিন্তু বইমেলা বা ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে থাকে আলাদা পরিকল্পনা। যেহেতু একটি উপলক্ষ চলে আসে, তাই দেশের সবার মনোযোগ

এরপর ৩য় পৃষ্ঠায়

প্রধান সম্পাদক ও প্রকাশক : মাহমুদুল হাসান | **সম্পাদক :** আজহার ফরহাদ
সম্পাদনা পর্ষদ : তৌহিদ ইমাম, আমিরুল আবেদিন আকাশ, রাশেদ সাদী, আরিফুল হাসান
অলংকরণ : লুৎফি রুনা, রাজীব রাজু, রাজীব দত্ত | **গ্রাফিক ডিজাইন :** সাইফুল সাগর, ফয়সাল মাহমুদ, মাহমুদ মিজু

বেঙ্গলবুকস-কিন্ডারবুকস নিবেদিত একটি বইমেলা প্রকাশনা। প্রকাশক কর্তৃক নোভা টাওয়ার ২/১ নয়া পল্টন, ঢাকা ১০০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রিন্ট ওয়ার্কস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ০১৯৫৮৫১৯৮৮২, ০১৯৫৮৫১৯৮৮৩ ● ইমেইল : info@kinderbooks.com.bd, info@bengalbooks.com.bd ● ওয়েব : www.kinderbooks.com.bd, www.bengalbooks.com.bd